ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জঃ দ্বিতীয় পর্ব

মো. জুলকারনাইন, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোরশেদা আক্তার
তাসলিমা আকতার, মনজুর ই খোদা

১০ নভেম্বর ২০২০

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোরশেদা আক্তার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আকতার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মনজুর ই খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন এলাকার স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জনের জন্য সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম, এবং মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব

সার সংক্ষেপ*

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

করোনা ভাইরাস ডিজিজ, ২০১৯ (কোভিড-১৯) সংক্রামক রোগটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচিত। ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে চার কোটি ৫৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৩১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭২১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি সারা বিশ্বে শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থান, বিশ্ব বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ৮ মার্চ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বমোট চার লক্ষ সাত হাজার ৬৮৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং পাঁচ হাজার ৯২৩ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মোট আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে সারা বিশ্বের মধ্যে ২০তম অবস্থানে রয়েছে। তবে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) ও আইসিডিডিআর,বি-এর একটি যৌথ জরিপের মাধ্যমে জানা যায় জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঢাকায় আক্রান্তের হার ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ ঢাকার প্রায় এক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতে পরবর্তী তিনমাসে আক্রান্তের হার ৬০-৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। দেশে করোনার সংক্রমণের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে কমে আসলেও এটি এখনো একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে বিরাজমান। করোনার প্রভাবে সারা বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়েছে পড়েছে, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্মুখীন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতোপূর্বে টিআইবি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যা ১৫ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় সংক্রমণের প্রথম তিন মাসের মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং কী ধরনের নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা সুশাসনের আলোকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই দ্বিতীয় দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ: পরিসংখ্যা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত পদ্ধতি পদ্ধতি ব্যবহার করে অনলাইন ও টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ, ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণায় ব্যবহৃত জরিপ পদ্ধতি

জরিপ		নমুনায়ন পদ্ধতি	গবেষণা এলাকা (জেলা)	নমুনার সংখ্যা
স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা		কোভিড ও নন-কোভিড সেবা গ্রহীতার টেলিফোন ও অনলাইন সাক্ষাৎকার	৪৭	১,০৯১
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির	নগদ অর্থ প্রণোদনা	প্রতিটি এলাকা থেকে ৩০ জন নগদ সহয়তা ও ৩০ জন ওমমএস উপকারভোগী নির্বাচন	৩৫	১,০৫০

* ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকায় প্রকাশিত 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব' শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

জরিপ		নমুনায়ন পদ্ধতি	গবেষণা এলাকা (জেলা)	নমুনার সংখ্যা
উপকারভোগী	ওমমএস কার্ড		৩২	৯৬০
স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এলাকার কোভিডের জন্য নির্ধারিত জেলা পর্যায়ের প্রতিটি হাসপাতালের একাধিক স্বাস্থ্যকর্মীর নিকট হতে যাচাই-বাছাই পূর্বক তথ্য সংগ্রহ	৩৫	৩৭ (মেডিক্যাল কলেজ ৭ ও জেলা হাসপাতাল ৩০)

গুণগত তথ্য সংগ্রহ: মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার এবং ৪৩টি জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দলীয় আলোচনা হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণায় ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সময়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার আওতা

পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত আটটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন;
২. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম);
৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা);
৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা);
৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন);
৬. সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ
৭. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি;
৮. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি;

বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সুশাসনের সাতটি সূচকের আলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, করোনা মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে পূর্বের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আইনের শাসন

প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ রয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহামারি করোনাভাইরাস তথা সকল ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ - এ মহামারি সৃষ্টিকারী যে কোনো ব্যাধিকে দুর্যোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই আইন দুইটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসহ বিভিন্ন ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ অনুসরণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) অনুসরণ না করা, সরাসরি

ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দর প্রস্তাব গ্রহণ, সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা লঙ্ঘন, মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সনদ ও প্রমাণপত্র যাচাই না করা, এবং মালামাল ক্রয়ে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে কারিগরি উপ-কমিটি গঠন না করা উল্লেখযোগ্য।

সাড়া দান

পরীক্ষাগার ও নমুনা পরীক্ষার সম্প্রসারণে ঘাটতি: একটি দেশে পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে কিনা তা আক্রান্ত ব্যক্তির শনাক্তের হার (Positivity rates) দ্বারা বোঝা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী একটি দেশে শনাক্তের হার মোট নমুনা পরীক্ষার ৫ শতাংশ হওয়া উচিত। এর বেশি হলে উক্ত দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে নির্দেশ করে। বাংলাদেশে ১৬ জুন থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গড় শনাক্তের হার ছিল ১৭.৪% (সর্বোচ্চ ৩১.৯%)।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধি করতে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ভারতে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানে ১৪টি মেন্টর প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে পরীক্ষার সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তৃণমূল পর্যায়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাপক মাত্রায় এন্টিজেন পরীক্ষা, মান নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থা, দ্রুততার সাথে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির চাহিদা নিরূপণ ও সরবরাহে ওয়েবভিত্তিক সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা প্রচলন, পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দফা বেসরকারি পরীক্ষার ফি হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভারত এপ্রিলের শুরুতে দিনে চার হাজার পরীক্ষার সক্ষমতা হতে অক্টোবরে দিনে ১৫ লক্ষ পরীক্ষার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত আইসোলেশনের জন্য ৪৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হলে বা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে তাকে আইসোলেশনে থাকতে উৎসাহ দিতে ১,৫০০ ডলার প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশের 'জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা'য় সংক্রমণ বিস্তারের সাথে সাথে সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির পরীক্ষা, সংক্রমণের প্রবণতা অনুধাবন এবং অন্যান্য কৌশলের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে সারা দেশব্যাপি পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি/ সম্প্রসারণের কথা বলা হলেও সারাদেশে ২৯টি জেলায় ১১৩টি পরীক্ষাগার করা হয়েছে। বাকী ৩৫টি জেলায় কোনো পরীক্ষাগার নেই, অন্য জেলা থেকে পরীক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন জেলায় কোন ভিত্তিতে পরীক্ষাগার করা হয়েছে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় না। জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার করার ক্ষেত্রে আক্রান্তের সংখ্যা ও শনাক্তের হার বিবেচনা করা হয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পঞ্চগড়, মুন্সিগঞ্জ এবং বান্দারবানে শনাক্তের হার যথাক্রমে ২৫.৩, ২৪.০ এবং ২২.৮ শতাংশ। উচ্চ শনাক্তের হার নির্দেশ করছে যে এই জেলাগুলোতে পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে না, কিন্তু এই জেলাগুলোতে কোনো পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা করা হয় নি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলায় উচ্চমাত্রার শনাক্তের হার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৫ জুন পরবর্তী সাড়ে চার মাসে মাত্র নতুন আটটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়।

১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে 'কারিগরি পরামর্শক কমিটি'সহ বিশেষজ্ঞরা প্রতি দিনে ২৫-৩০ হাজার পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৫ জুন হতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ১৩ হাজার করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত একদিনও ২০ হাজারের বেশি পরীক্ষা করতে পারে নি। ১ জুলাই হতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে (গড়ে ২২.৫%) পৌঁছায়, অর্থাৎ এই সময়ে পরীক্ষার প্রয়োজন সর্বোচ্চ অবস্থায় ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে জেলা পর্যায়ে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ না করে এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বাংলাদেশে বিপরীতমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্রে উপসর্গবিহীন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষাকে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে উল্লেখ করে ও পরীক্ষার চাপ কমাতে ২৯ জুন হতে সরকারি পরীক্ষাগারে ২০০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সমালোচনার মুখে ফি ১০০ টাকা করা হলেও তা পুরো প্রত্যাহার করা হয় নি। এই সিদ্ধান্তের পর পরীক্ষার সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পায়।

পরীক্ষার হারের দিক হতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫ জুনের মতো এখনো ৭ম অবস্থানেই আছে। আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ২০তম অবস্থানে থাকলেও জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অবস্থান বিশ্বে ১৬২তম (১৫ জুন-এ এই অবস্থান ছিল ১৪৯তম)। নমুনা পরীক্ষার বৈশ্বিক গড়ের (১০.৫%) চেয়ে বাংলাদেশ (১.৫%) এখনো অনেক পিছিয়ে।

পরীক্ষাগার সম্প্রসারণে এলাকা ও শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য: ১৫ জুন ২০২০ এর পরবর্তী সময়ে ৬০ টি পরীক্ষাগার হতে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে নতুন ৫৩টি পরীক্ষাগার বৃদ্ধি করে মোট পরীক্ষাগারের সংখ্যা করা হয় ১১৩টি। যার অধীকাংশই ঢাকার মধ্যে (৬৭টি) এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় ৪৬টি। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ ৮টি পরীক্ষাগার রয়েছে। অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগামে ৬৬ শতাংশ (৭৫টি) পরীক্ষাগার অবস্থিত। গবেষণার এই সময়ে ঢাকার মধ্যে নতুন করে ৩৭টি পরীক্ষাগার যুক্ত হয় এবং ঢাকার বাইরে মাত্র ১৬টি নতুন পরীক্ষাগার যুক্ত হয়। এবং মাত্র নতুন আটটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয় (২১টি জেলা হতে ২৯টি জেলা)। এছাড়া এই সময়ে নতুন ৩৪টি বেসরকারি পরীক্ষাগারকে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বেসরকারি

বাণিজ্যিক পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৯টি। পক্ষান্তরে এই সময়ে মাত্র ১৯টি নতুন সরকারি পরীক্ষাগার যুক্ত করে মোট সরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা বেড়ে হয় ৬৪টি। সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, বেসরকারি পরীক্ষাগারের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি এবং জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করার মাধ্যমে কার্যত শহরকেন্দ্রিক স্বচ্ছল ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সীমিত করার মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা কম হওয়াকে রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচারের অভিযোগ রয়েছে।

সারাদেশে মোট ১৩ টি জেলার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৩টি বুথে বিদেশগামীদের নমুনা পরীক্ষার বুথ ছিল এবং ঢাকায় ছিল মাত্র একটি। ফলে ৪৮ ঘণ্টা আগে নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও সময়মত তা হাতে না পাওয়ায় যাত্রীদের অনেকেই ফ্লাইট ধরতে পারছিলেন না। পরীক্ষাগার থেকে যথা সময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীদের কর্মক্ষেত্রে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগার করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণে ঘাটতি: বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করতে নতুন করে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করলেও বাংলাদেশে কোভিডের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি হাসপাতালে রোগী না থাকার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম বাতিল করে সাধারণ চিকিৎসা চালুর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে ঘাটতি: বিশেষজ্ঞরা সংক্রমণের 'দ্বিতীয় প্রবাহের' পূর্বাভাস দিলেও তা মোকাবিলায় করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ক যথাযথ পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। করোনা সংক্রমণের সঠিক চিত্র পেতে এবং দ্রুততার সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করতে গত ৩ জুন কারিগরি পরামর্শ কমিটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষার পাশাপাশি এন্টিবডি ও এন্টিজেন পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করলেও এখনো তা কার্যকর করা হয় নি।

প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বিতরণে বৈষম্য: করোনা ভাইরাসে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে ২০টি প্যাকেজে এক লাখ ১১ হাজার ১৪১ কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রণোদনার ২৬ শতাংশ বিতরণ করা হয়। ২০টি প্যাকেজের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা আটটি প্যাকেজে মোট প্রণোদনার পরিমাণ ৮৫,৭৫০ কোটি টাকা, যা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা (প্রায় ৫৪%) বিতরণ করেছে। বৃহৎ শিল্প ও রপ্তানি খাতে উচ্চ হারে (৭৩%-১০০%) প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে। এবং ব্যবসায়ীদের চাপে কয়েক দফায় বৃহৎ শিল্প ও রাপ্তানী শিল্পখাতে প্রণোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্ত মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রান্তিক কৃষক ও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে বিতরণ হার খুবই কম (২১%-৪২%)। রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবিরের কারণে এই প্যাকেজের আওতায় বৃহৎ শিল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাংকগুলো বেশ সক্রিয় থাকলেও ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি (সিএমএসএমই) এবং প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃ অর্থায়ন কর্মসূচি খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি বাড়িয়েও এসব খাতে ঋণ বিতরণে গতি বাড়াতে পারছে না। অন্যদিকে ঋণ বিতরণ নীতিমালার কঠিন শর্ত, ঋণের বিপরীতে ঠিকমতো কাগজপত্র জমা দিতে না পারা, কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর নেটওয়ার্ক ও দক্ষ কর্মীর অভাব, ঋণের পরিমাণ কম হওয়া, খরচের তুলনায় সুদ হার কম হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলো মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, প্রান্তিক কৃষক খাতে কম ঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করা হয় নি ও এ সংক্রান্ত সক্ষমতা বাড়ানো হয় নি।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক কৃষকেরা প্রণোদনা না পেলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সার্কুলারের মাধ্যমে রফতানি বাণিজ্যে জড়িত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকেও সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে ঘাটতি: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ করোনাকালে সরকারের প্রণোদনা সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা ও সমতলে সাঁওতালসহ অন্য জাতিগোষ্ঠীর মাত্র ৪ হাজার ১০০টি উপকারভোগী পরিবার (মোট পরিবারের ২৫%) সরকারি সুবিধা পেয়েছে। করোনাকালে দেশের সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ৯২ ভাগের আয় কমে গেছে, তাদের মধ্যে পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। করোনাকালে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বেতনভোগী কর্মজীবীদের ৭২% চাকরি হারিয়েছেন কিংবা কর্মক্ষেত্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা চাকরিতে আছেন তাঁদের মধ্যে ২০% আংশিক বেতন পাচ্ছেন। হিজড়া, জেলে, হরিজন ও প্রতিবন্ধীদের কেউ কেউ এককালীন সাহায্য পেলেও অধিকাংশই করোনাকালে কোনো সরকারি সহায়তা পান নি। হরিজনসহ অনেক পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুরক্ষা সামগ্রী পায় নি এবং চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রণোদনা ভাতার ঘোষণা থাকলেও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য কোনো প্রণোদনা নেই। ৫০ লাখ দুস্থ মানুষের মাঝে নগদ সহায়তা বিতরণের কথা থাকলেও জুলাই মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ লাখ মানুষ এই

টাকা পায় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ উপকারভোগী এই সুবিধা পেয়েছে পেয়েছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগী তালিকায় গরমিল থাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ সরকারের ত্রাণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

সক্ষমতা

অকার্যকর কমিটি: করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোট কমিটির সংখ্যা ৪৩টি। জাতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় সংস্করণে কমিটি ছিল ১১টি, পঞ্চম সংস্করণে কমিটি কমিয়ে ছয়টি এবং সপ্তম সংস্করণে পুনরায় কমিটির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৩টি করা হলেও বৃদ্ধির কারণ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। দেশের একাধিক বিশিষ্টজনের সম্মতি ছাড়াই কিছু কমিটিতে রাখা হয়েছে। আবার কোনো কমিটি বিলুপ্ত হলেও সদস্যদের তা জানানো হয় নি। কোনো কোনো ব্যক্তির নাম চার-পাঁচটি কমিটিতেও দেখা গেছে। অনেক কমিটির কোনো সভা এখনো হয়নি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলো কার্যকর থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় অনিয়মিতভাবে সভা করা হয়।

ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি করোনা মোকাবিলায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে নি। অনেক সিদ্ধান্ত কমিটির বাইরে থেকে আসার অভিযোগ রয়েছে। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। জাতীয় কমিটিতে ব্যাপক আলোচনা ছাড়াই করোনা মোকাবিলার জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদন এবং সাতটি সংস্করণ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত পাবলিক হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি বিভিন্ন সময়ে করোনা মোকাবিলায় নানা সুপারিশ করলেও অনেক সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না বলে কমিটির অভিযোগ। যেমন, করোনা সংক্রমণের ব্যাপকতা অনুসারে এলাকা বিভাজন ও লকডাউন, পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি, এন্টিজেন ও এন্টিবডি টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

করোনা মোকাবিলায় গঠিত কমিটিগুলোর অধিকাংশ সক্রিয় না থাকা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কমিটিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায় নি। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে এবং আক্রান্ত রোগীদের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এবং গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি তদারকি করতে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ হতে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্সকে করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হলেও এখানে সকল সদস্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী - একজন বিশেষজ্ঞকেও রাখা হয়নি।

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি: ১৫ জুন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও (৬০টি হতে ১১২টি) নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, যার অন্যতম কারণ সক্ষমতার ঘাটতি। ১৬ জুন থেকে প্রতিদিন গড়ে ১১টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২ আগস্ট ২০২০ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৮টি এবং ১৭ অক্টোবরে ৩৪টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয় নি। পরীক্ষাগারে যান্ত্রিক ত্রুটি, পরীক্ষাগার রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষাগারে ভাইরাসের সংক্রমণ ইত্যাদি কারণে পরীক্ষাগার বন্ধ থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ বেশি না হলে বেসরকারি ল্যাব পরীক্ষাগার বন্ধ রাখে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি:

বিভিন্ন সময় দেশে কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দাবি করা হয়। এমনকি বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে ইউরোপ আমেরিকার দেশসমূহের চিকিৎসা সেবার সাথে তুলনা করা হলেও এখনো বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি লক্ষণীয়। সরকারি তথ্যমতে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা মাত্র ৫৫০টি, ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ৪৮০। কিন্তু এই সুবিধার অধিকাংশ ঢাকা শহর-কেন্দ্রিক। মোট ৫৫০টি আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৩৭৪টি ঢাকা বিভাগের (৬৮%) যার মধ্যে আবার ৩১০টি ঢাকা শহরের মধ্যে অবস্থিত (৫৬.৩%) এবং চট্টগ্রামে ৩৯টি (৭%) আইসিইউ শয্যা রয়েছে, বাকি ৬২টি জেলা ও বিভাগীয় শহরের জন্য বরাদ্দ মাত্র ২০১টি (৩৭%)। অন্যান্য বিভাগগুলোর মৃত্যুহার ঢাকা বিভাগের চেয়ে বেশি হলেও চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে জোরদার করা হয় নি। ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। জনসংখ্যা অনুপাতে দেখা যায়, খুলনা ও রংপুর বিভাগে জটিল রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধার দিকে থেকে পিছিয়ে আছে। ১৫ জুন-পরবর্তী সময়ে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও এখনো ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। এখনো জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে দক্ষ জনবল (৪৮.৬%), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (৫১.৪%) এবং নিরাপত্তা সামগ্রীর ঘাটতি (৩৬.২%) রয়েছে।

এছাড়া কোভিড মোকাবিলায় জনবলের ঘাটতি মোকাবিলায় চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করা হলেও বিভিন্ন হাসপাতালে জনবল সঙ্কট লক্ষ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শতভাগ হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৮৯.১% হাসপাতালে নার্সের পদ শূন্য থাকলেও গত তিনমাসে ৫৬.৮% হাসপাতালে চিকিৎসক এবং ৪৮.৫% হাসপাতালে এখন পর্যন্ত নার্স নিয়োগ দেওয়া হয় নি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিয়মিতভাবে বলা হয় যে সারা দেশে শয্যা ও আইসিইউ এর কোনো সংকট নেই, রোগী না থাকায় এসব শয্যা খালি পড়ে থাকে। রোগী না থাকার কারণে কয়েকটি কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতাল ইতোমধ্যে বন্ধ করা

হলেও জরিপে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের একাংশ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটরের সংকট থাকার কারণে এই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। জরিপে দেখা যায় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সেবাগ্রহীতাদের ৫.৪% অক্সিজেন সরবরাহ, ৩২.৪% ভেন্টিলেশন সেবা এবং ৩০.২% আইসিইউ শয্যা পায় নি। এছাড়া সেবা গ্রহীতাদের ৩.১% কখনোই চিকিৎসক বা নার্সের সেবা পান নি এবং ৩৪.৩% ও ৪৮.৭% মাঝে মাঝে বা দিনে একবার করে নার্স ও চিকিৎসকের সেবা পেয়েছেন।

হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি: করোনা চিকিৎসায় নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য শোধনে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসা বর্জ্য পৃথক করা বা নিরাপদে ধ্বংস করার যথাযথ নিয়মগুলো মানা হচ্ছে না। অনেক হাসপাতালে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পোড়ানো হলেও যথাযথভাবে বিধি অনুসরণ না করায় পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি থাকছে। অধিকাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা বর্জ্য 'বায়োহ্যাজার্ড' ব্যাগে না ভরে ড্রামে বা উন্মুক্ত অবস্থায় খোলা ডাস্টবিনে ফেলে রাখা হচ্ছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন গড়ে ২০৬ টনের বেশি করোনা বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত সামগ্রী ধ্বংস না করায় এগুলো নতুনভাবে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করছে। দেশের ১৪ হাজার ৭৭০টি সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র এক হাজার ৪৫৮টি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সঠিক নিয়মে ধ্বংস করা হয়। দেশের ৯০ ভাগের বেশি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য মিশে যাচ্ছে সাধারণ বর্জ্যের সাথে, এর সাথে চলমান করোনাভাইরাস চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য মিশে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে কয়েক লাখ পরিচ্ছন্নতা কর্মীর। সারাদেশে হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩৮ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে চারজন। এছাড়া পেশাদার পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বাইরে বর্জ্য থেকে বিভিন্ন জিনিস কুড়িয়ে বিক্রি করার পেশায় প্রায় ৪০ হাজার পথ শিশু মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে অল্পসংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে এমন উদ্যোগ নেই।

হাসপাতালে মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি: প্রথম পর্বের গবেষণায় করোনা চিকিৎসা সেবায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর যে ঘাটতি পাওয়া গিয়েছিল সেক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। তবে অধিকাংশ হাসপাতালে সুরক্ষা সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ থাকলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে না। অনেক হাসপাতালে শুধু কোভিড ইউনিটে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয় (৪০.৫% হাসপাতালে কোভিড ইউনিটের চিকিৎসকদের ও ৩৫.১% হাসপাতালে নার্সদের)। আবার কোথাও পিপিই'র আংশিক সরবরাহ করা হয় (২.৭% হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের আংশিকভাবে) ও অনিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয় (৫.৪% হাসপাতালে চিকিৎসকদের ও ৮.১% হাসপাতালে নার্সদের)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালের ৪৮.৬ শতাংশে এন ৯৫/কেএন ৯৫/এফএফপি২ মাস্ক সরবরাহ করা হয় না, শুধু সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করা হয়। অনেক হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ উদ্যোগে মাস্ক কিনে নেন। করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২,৮৫৩ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এবং ১০১ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া ২২ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে সাত হাজার ২৪৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয় এবং ১০ জন নার্স মৃত্যুবরণ করে।

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে কার্যকরতার ঘাটতি: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। এক-চতুর্থাংশ আসন খালি রেখে গণপরিবহন চলাচলের নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানতে দেখা যায় নি। পশুর হাট, গার্মেন্টস, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার শর্ত আরোপ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী জরিপে ৬৮.২% ওএমএস উপকারভোগীর মতে চাল বিতরণে সামাজিক দূরত্ব মানা হয় নি। লকডাউন কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞগণ ১২টি কার্যক্রম (জনসম্পৃক্ততা, শনাক্ত ব্যক্তির আইসোলেশন, শতভাগ মাস্ক নিশ্চিত করা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ইত্যাদি) পরিচালনার সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়নে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এলাকাভিত্তিক পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংক্রমণভিত্তিক এলাকা বিভাজন (রেড, ইয়েলো ও গ্রিন জোন) এবং রেড জোনে লকডাউন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। লকডাউন সফল করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে বিশেষ ভূমিকা পালন করায় ঘাটতি এবং জনগণের সম্পৃক্ততার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

সমন্বয় ও অংশগ্রহণ

করোনা মোকাবিলায় আক্রান্ত চিহ্নিতকরণ, কোভিড চিকিৎসা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ রোধ, ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা চলমান রয়েছে। বিশেষকরে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা সংক্রান্ত অর্ধশতাধিক কমিটি করা হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই, বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, জাতীয় কমিটির সাথে এসব কমিটির যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ফলে করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা চলমান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আমলা নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের সাথে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বিচ্ছিন্ন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে এসব প্রতিষ্ঠান

সেবা প্রদান করছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে করোনার এন্টিবডি ও এন্টিজেন টেস্ট অনুমোদনেই চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদনের একমাস পরেও এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ত্রাণ ও নগদ সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয় নি। এক্ষেত্রেও প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়হীনতার কারণে সারা দেশে লকডাউন কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

স্বচ্ছতা

করোনা সংক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক তথ্যের সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি দাবি করে অধিদপ্তর হতে টেলিভিশনে প্রচারিত নিয়মিত বুলেটিনটি ১২ আগস্ট ২০২০ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিদিনের এই বুলেটিনে করোনা বিষয়ক নিয়মিত তথ্য ছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হতো। যদিও করোনা সংক্রমণ শনাক্ত এবং মৃত্যু পর্যালোচনায় দেখা যায় এটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমেনি।

মতপ্রকাশে বিধি-নিষেধ: ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক গণমাধ্যমে করোনা বিষয়ক তথ্য ও মতামত প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীরা করোনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও মতামত গণমাধ্যমে তুলে ধরার প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এর বিধি ২২-এর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়, যা তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। করোনাকালীন উক্ত আইন ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। আর্টিকল-১৯ এর তথ্য অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় ২০২০ সালের প্রথম নয় মাসে (সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) ২৯১ জনের বিরুদ্ধে মোট ১৪৫ টি মামলা করা হয়। যার মধ্যে ৬০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ৩৪টি মামলা করা হয় এবং ৩০ জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। ডিজিটাল আইনে যে মামলাগুলো হয়েছে সেগুলোর তিন-চতুর্থাংশের বেশি অভিযোগ সরকার, সরকারি দলের লোকজন এবং সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্যেও প্রেক্ষিতে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্যমতে এই নয় মাসে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নিয়ে সমালোচনাধর্মী সংবাদ প্রকাশের কারণে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় গণমাধ্যমের ১০ জন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ডিজিটাল আইনে যে মামলাগুলো হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ অভিযোগ সরকার, সরকারি দলের লোকজন এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্যের পেক্ষিতে করা হয়েছে। করেনা সংকট মোকাবিলায় সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা করার কারণেও মামলা করা হয়েছে। এছাড়া করোনাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশে গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনলাইন পোর্টালকে নতুন করে নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা রেখে 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭' সংশোধন করা হয় যা মুক্ত সাংবাদিকতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অধিকন্তু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ (জাতীয় সম্প্রচার কমিশন) গঠন এবং অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা (সংশোধিত) চূড়ান্ত না করেই গণমাধ্যমগুলোকে নতুন করে নিবন্ধনের নির্দেশ সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারের 'সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ' প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে।

ক্রয় সংক্রান্ত প্রকাশে ঘাটতি: সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে ক্রয় কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্যের উন্মুক্ততা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোভিড-১৯ মোকাবেলায় চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রকাশ না করা, চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির নাম/তালিকা প্রকাশ না করা, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও মালিকের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করা, সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবার মান যাচাইকরণ দলিল প্রকাশ না করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনার সময়ে স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে বিদ্যমান দুর্নীতি এবং নতুনভাবে সংগঠিত দুর্নীতির উন্মোচন ঘটেছে। চিকিৎসা ও সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা সেবা, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে।

বিশেষ প্রণোদনা না দেওয়া: জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সরাসরি সেবা দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত সারা দেশে সাত হাজার ২৪৯ জন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১০০ জন চিকিৎসক ও ১০ জন নার্স মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ৯ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তাদের জন্য ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা বা বিশেষ সম্মানী (দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রদান) চার মাস অতিবাহিত হলেও দেওয়া হয় নি।

সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতি: জরুরি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। অনেক ক্ষেত্রে মৌখিক আদেশে ক্রয় করা হয়েছে, এবং কোনো ক্রয়ে ই-জিপি ব্যবহার করা হয় নি। কয়েকটি সিন্ডিকেট স্বাস্থ্য খাতের সকল ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। এসব সিন্ডিকেটে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি, বিভিন্ন হাসপাতালের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ দুদকের কিছু কর্মকর্তার সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগও পাওয়া যায়।

করোনা মোকাবিলায় বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পে মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিইর মতো জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি অটোমোবাইল কোম্পানিকে ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয়। তবে প্রতিষ্ঠানটি সাড়ে ৯ কোটি টাকা অগ্রিম নিলেও যথাসময়ে কোনো মালামাল সরবরাহ করে নি। টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠায় পরবর্তীতে কিছু মাস্ক ও গ্লাভস সরবরাহ করে, যার মধ্যে ২৪ হাজার মাস্ক ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল।

এই প্রকল্পের ক্রয়ে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর) ২০০৮ অনুসরণ করা হয় নি। ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) অনুসরণ করা হয় নি। সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একাধিক দরপত্রদাতার কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহবানের নিয়ম থাকলেও একজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যা পিপিআর এর বিধি ৭৫ (২) এর লঙ্ঘন। একক দরদাতার নিকট হতে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা লঙ্ঘন এবং একক দরদাতার নিকট হতে সরাসরি ক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয়মূল্য সীমা (২০ লক্ষ টাকা) লঙ্ঘন করে ৩১ কোটি টাকার ক্রয় আদেশ প্রদান করে যা ধারা ৭৬ (১)(ঞ) লঙ্ঘন। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সনদ ও প্রমাণপত্র যাচাই না করে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কাজ দেওয়া হয় যা উক্ত বিধিমালার ধারা ৪৮(২), ৯৮ (১৫) (ক)(গ) লঙ্ঘন। এছাড়াও মালামাল ক্রয়ে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ প্রস্তুত করতে কারিগরি উপ-কমিটি গঠন না করাও একই বিধিমালার ধারা ৮(১৪) লঙ্ঘন হয়েছে। ফলে মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই'র মতো জরুরি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নামসর্বস্ব যে প্রতিষ্ঠানকে ৩২ কোটি টাকার কাজ দেওয়া হয় তা একটি অটোমোবাইল কোম্পানি (গাড়ি ব্যবসায়ী)।

একই প্রকল্পের অধীন অপর একটি ক্রয়ে সুরক্ষা সামগ্রী পেশাক ক্রয়ের জন্য ৫০ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প বাজেট বরাদ্দ করা হয়। প্রতিটি পোশাক বাজার মূল্যের চেয়ে চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পিপিই ক্রয় করে খরচ হয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকা। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকি বিবেচনায় চতুর্থ ধাপের পিপিই ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও প্রকল্প পরিচালকের একক সিদ্ধান্তে চিকিৎসকদের জন্য প্রথম ধাপের এক লাখের বেশি পিপিই ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। এসব সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত নয় বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের গুদামে মাল উঠাতে দেয় নি। পরবর্তীতে প্রকল্পের পরিচালক ঢাকা বাদে ৬৩ জেলায় এক হাজারটি করে এই পিপিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পিপিইর মান যাচাইয়ের জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও কমিটির আহ্বায়ক ও কমিটির সদস্যদেরকে কেনাকাটার বিষয়ে অবহিত করা হয় নি এবং পিপিই এর মান যাচাই-বাছাই করা হয় নি।

ঢাকার একটি কোভিড-ডেডিকেটেড হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ক্রয় কমিটিকে অবহিত না করে হাসপাতালটির তত্ত্বাবধায়ক নিজের শ্যালক ও ভাগ্নের একটি নামসর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ দেন। স্টোরে মালামাল জমা দেওয়ার আগেই বিল পরিশোধ করে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তা আর সরবরাহ করা হয় নি। করোনার সময়ে এ ধরনের ৯৩টি ক্রয়ে বিল কারসাজির মাধ্যমে ১২ কোটি ১০ লাখ ৬৫ হাজার ৯০০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।

একটি প্রকল্পের অধীনে ৮৩টি হাসপাতালে লিকুইড অক্সিজেন ট্যাংক বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৩টি হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাংক স্থাপনে সরাসরি ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পিপিআর-এর বিভিন্ন বিধি লঙ্ঘন করে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজনের কাছ থেকে দর প্রস্তাব আহবান করা হয়, কেন্দ্রীয়ভাবে দর যাচাই কমিটি গঠন করা হয়নি, এবং যান্ত্রিক বিষয়গুলো দেখভালের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিয়ে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। দুর্নীতির কারণে এসব হাসপাতালে ট্যাংক স্থাপনে অতিরিক্ত ব্যয় হবে প্রায় ১৬৬ কোটি টাকা।

নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতি: যাচাই না করার ফলে লাইসেন্সবিহীন এবং ভুয়া হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা পরীক্ষা করার চুক্তি সম্পাদন করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার মাঠ পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহ করে কোনো পরীক্ষা না করেই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে বুথ স্থাপন করে নমুনা সংগ্রহ করে তা ফেলে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইইডিসিআরের প্যাডে ফল লিখে তা ইমেইল করে পাঠিয়ে দিত, এবং প্রতি পরীক্ষার জন্য জনপ্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা নিত। এই হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান করোনার ভুয়া টেস্ট করে সাত কোটি ৭০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে একটি সরকারি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এই অনুমোদন নেয়। এ ধরনের কার্যক্রমে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়।

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য লাইসেন্সবিহীন হাসপাতালের সাথে সরকার করোনা চিকিৎসার চুক্তি করে। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান তিন হাজার ৯৩৯ জন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষাগার থেকে বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়ে

নিয়ে আসলেও নমুনা পরীক্ষার ফি হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩,৫০০ টাকা করে জনপ্রতি আদায় করে। এভাবে তারা এক কোটি ৩৭ লাখ ৮৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়।

একটি মেডিক্যাল কলেজ করোনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে অনুমোদন নেয়, কিন্তু করোনা পরীক্ষার জন্য যথাযথ মেশিন না থাকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উক্ত হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার অনুমোদন বাতিল করে। তারপরও এই মেডিক্যাল কলেজ অবৈধভাবে অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে রোগীদের কাছ থেকে তিন থেকে ১০ হাজার টাকা করে আদায় করে। এছাড়া অন্য হাসপাতাল হতে পরীক্ষা করিয়ে নিজেদের প্যাডে রিপোর্ট দিত।

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি: গবেষণার জরিপে দেখা যায়, এখনো ৩৪.৪% সেবা গ্রহীতাকে তিন বা ততোধিক দিন প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা প্রতিবেদন দেরিতে পাচ্ছেন, অপেক্ষার কয়েকদিন তাদের দ্বারা অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৯.৯% নমুনা পরীক্ষায় ভুল প্রতিবেদন পাচ্ছেন। যথাসময়ে প্রতিবেদন না পাওয়ায় অনেক প্রবাসীর কর্মক্ষেত্রে ফেরার ক্ষেত্রে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, অনেক কষ্টে জোগাড় করা ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া প্রতিবেদন নিয়ে ভ্রমণ করায় ছয়-সাতটি দেশে বাংলাদেশীদের গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং যাত্রীদের ফেরত পাঠানো হয়, এবং অনেক দেশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ গ্রহণ করেনি।

নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতাদের হয়রানিসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষা (৫১.৪%), পরীক্ষার জন্য তদবির বা সুপারিশ জোগাড় করতে বাধ্য হওয়া (৩৯.৬%), নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া (২৬.০%), নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা দিতে বাধ্য হওয়া (১৫.০%) ইত্যাদি। যে সকল সেবাগ্রহীতা বেসরকারি পরীক্ষাগারগুলো থেকে নমুনা পরীক্ষা করেছে তাদের ৪.১ শতাংশকে করোনাভাইরাস পরীক্ষার সাথে অন্যান্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য সুপারিশ জোগাড় করতে হয়েছে পুরুষদের তুলনায় বেশি। সার্বিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের ১৫ শতাংশের কাছ থেকে নমুনা পরীক্ষায় নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়েছে। সরকারি পরীক্ষাগারের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩,২০০ টাকা, এবং বেসরকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭,৬৫০ টাকা। নমুনা পরীক্ষায় দ্রুত সিরিয়াল পাওয়ার জন্য সার্বিকভাবে ৪.৫% সেবাগ্রহীতা গড়ে ৯৪৬ টাকা ঘুষ দিয়েছেন।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি: করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতিও বিদ্যমান। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৩৫.১ শতাংশে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৫ জুন পরবর্তী সময়ে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও কিছু হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫৩.৮%) ও অনুপস্থিতি (১৫.৪%) পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং কিছু হাসপাতালে অনিয়ম-দুর্নীতি হ্রাস পেলেও তা অব্যাহত আছে, যেমন নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ (৩৮.৫%), মজুদ থাকা সত্ত্বে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করা (১৫.৪%)।

কোভিড চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান থাকার কারণে সেবাগ্রহীতারা কোভিড চিকিৎসা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে বা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। স্বাস্থ্য সেবাগ্রহীতাদের ৩৭.৪% সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ভর্তি হওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মচারীর বাজে আচরণের শিকার হয় (১৪.৬%), স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করা হয় (১০.৬%), ভর্তির জন্য একাধিক হাসপাতালে যেতে হয় (১১.৮%)। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের হয়রানি বা সমস্যার কারণে অনেক সেবাগ্রহীতার মৃত্যু হয়েছে (৮.৭%)।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি: জরিপে নগদ সহায়তা উপকারভোগীদের ১২% তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল বলে জানান। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৬.১%), অনেকবার অনুনয়-বিনয়/অনুরোধ করা (২৪.৬%), নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৮.৯%), টাকা না পাওয়া (১০.৬%) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তালিকাভুক্ত হতে গড়ে ২২০ টাকা করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে জরিপে কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ ওএমএস চাল (১০ টাকা কেজি দরে) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১০% তালিকাভুক্ত হতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সুপারিশ জোগাড় করা (৩৭.১%), অনেকবার অনুনয়-বিনয়/অনুরোধ করা (২০.৬%), নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বা ঘুষ দেওয়া (১৫.৫%) ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

জরিপে নগদ সহায়তায় উপকারভোগীদের ৫৬% সহায়তা পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও এখনো টাকা না পাওয়া (৬৯.০%), মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কর্তৃক কমিশন/ফি কেটে রাখা (২৬.৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নগদ টাকা তুলতে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট কমিশন/ফি বাবদ গড়ে ৬৮.২০ টাকা করে কেটে রাখে। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের নিকট হতে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করা হয়।

জরিপে ওএমএস (চাল) সহায়তায় উপকারভোগীদের ১৫.০ শতাংশ চাল পেতে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছিল। এক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ছিল, পরিমাণে কম দেওয়া (৩৬.৮%), তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও চাল কিনতে না পারা (২০.৬%), ওজন না করে বালতিতে অনুমান করে চাল দেওয়া (১৯.৯%) ইত্যাদি।

নগদ সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর (৭৯.২%) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা (৪৮.৭%)। বিশেষ ওএমএস (চাল) বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সংসদ সদস্য, মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার/কাউন্সিলর (৬৫.৭%) ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার (৪০.১%) সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানায় সুবিধাভোগীরা। করোনাকালীন যেসব জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুনীতির প্রমাণ মিলেছে, তাদের ৯০ জনই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। একটি প্রতিবেদন হতে জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সরাসরি ও হটলাইনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা প্রকৃত দুস্থদের বঞ্চিত করে করোনাকালে সরকারের দেওয়া ত্রাণ ও নগদ অর্থ সহায়তাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।

করোনাকালীন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে এ পর্যন্ত শতাধিক জনপ্রতিনিধিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সাময়িক বরখাস্ত করে। তবে জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই (অন্তত ৩০ জন) উচ্চ আদালতে রিটের মাধ্যমে স্বপদে ফিরে এসেছে। এর কারণ হিসেবে অনেকক্ষেত্রে আদালতে জোরালোভাবে তথ্য উপস্থাপন না করা, সরকারপক্ষের আইনজীবীর আদালতে উপস্থিত না হওয়া, আসামিপক্ষ বা বরখাস্ত চেয়ারম্যানদের পক্ষের আইনজীবীদের জোরালোভাবে বরখাস্তের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আদালত সরকারের বরখাস্ত আদেশ স্থগিত করে রায় দেয়।

জবাবদিহিতা

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ধারাবাহিক উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার অন্যতম একটি জায়গা হতে পারতো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির। করোনাকালে এই কমিটির কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় নি। ২৪ মার্চ ২০২০ এর পর থেকে এই কমিটি কোনো সভা করে নি।

করোনাকালে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সরকারি ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হয়। কিন্তু রিজেন্ট হাসপাতাল ও জিকেজি-এর মতো দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বদলি ও চলতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। উপরন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এসব অভিযোগের দিকে নজর না দিয়ে তাদের কাজে মনোনিবেশ করতে বলা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চপদস্থ দুইজন কর্মকর্তার নির্দেশে একটি দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ থাকলেও দুদকের মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বদলি ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বেসরকারি হাসপাতালে করোনা সেবার অজুহাতে কয়েকগুণ বেশি সার্ভিস চার্জ গ্রহণ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অনিয়ন্ত্রিত বাজার অব্যাহত থাকলেও তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয় নি। উপরন্তু ৪ আগস্ট ২০২০ হতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হওয়ার অজুহাতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে পূর্ব অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনা মোকাবিলায় সরকারের কিছু কার্যক্রমে উন্নতি হলেও পূর্বের গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি এখনো বিদ্যমান। স্বাস্থ্যখাতে ইতিমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে, এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ কার্যক্রমে সংকট এখনো চলমান। সংঘটিত এসব অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য খাতের ওপর মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে বিতরণকৃত ত্রাণ হতে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আড়াল করা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এছাড়া তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সরকারের সংকোচনমূলক নীতি প্রয়োগের (সেবা ও নমুনা পরীক্ষা হ্রাস) মাধ্যমে শনাক্তের সংখ্যা হ্রাস হওয়াকে 'করোনা নিয়ন্ত্রণ' হিসেবে দাবি এবং রাজনৈতিক অর্জন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে এখনো আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা বিদ্যমান। শীত মৌসুমে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় কার্যকর প্রস্তুতির অভাব। শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত প্রণোদনা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের অনুকূলে পক্ষপাত করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা সেবা ও প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে এখনো পৌঁছেনি।

সুপারিশ

আইনের শাসন, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

১. স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। জরুরিসহ সকল ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে।

২. করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাত মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

৩. বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সকল জেলায় সম্প্রসারণ করতে হবে, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৪. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৫. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের সেবাসমূহকে (আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি) করোনা চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে এবং করোনায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে যে বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে হবে।

১০. গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল বা সংশোধন করতে হবে এবং হয়রানিমূলক সব মামলা তুলে নিতে হবে।

১২. বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৩. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত সাময়িক বরখাস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ মামলা পরিচালনা করতে হবে। এসব জনপ্রতিনিধিদের পরবর্তী যেকোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

১৫. সম্মুখসারির সব স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য প্রণোদনা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

****